বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 07 AUG 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

061

মতামত

পরীক্ষা পদ্ধতি ও একটি প্রস্তাব

শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতা না হয়ে প্রকৃত উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করতে পারে সেভাবে ঢেলে সাজানো উচিত নয় কি? আমাদের দেশে এমন একটি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে যে ব্যবস্থায় দেখা যায়, বছরান্তে মুখস্থ করা বিদ্যার পরীক্ষাই প্রধান্য বিস্তার করে আছে। পরীক্ষার আসল উদ্দেশ্য থেকে আমাদের বর্তমান পরীক্ষা পদ্ধতি অনেক দূরে সরে আছে। বর্তমানে পরীক্ষা পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি স্তরের শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থী যে পরিমাণ জ্ঞান লাভ করে তা নিরূপন ও মূল্যায়ন করা। পরিশেষে পরীক্ষার ফলাফলের সার্টিফিকেট প্রদান করা।

আসলে শিক্ষার্থীর জ্ঞান লাভের পরিমাণ জানার কোন উপায় প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় নেই। কিছু বাছা বাছা প্রশ্নের-উত্তর, যে ভালভাবে লিখতে পারে সেই ভাল ফল লাভের পাওনাদার হয়ে যায়। এই ভাবে আর যাই হোক না কেন, পরিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হতে পারে না। আর যার ফল হিসেবে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে বস্তায় বস্তায় নকল উদ্ধার, শিক্ষক বহিষ্কার, ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ ইত্যাদি দেখতে পাচ্ছি। এহেন অবস্থা দেশ ও জাতির জন্য কলংকজনক বৈকি! এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমি এই প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মন্ত্রী মহোদয়সহ সকল দেশবাসীর কাছে উপস্থাপনকরছি।

পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের আগে নিম্নলিখিত সমস্যা তিনটির সমাধান আশু প্রয়োজন। শুধু পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করা যাবে না।

(ক) ব্যয় বরাদ্দঃ শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের আগে একটি প্রশ্ন থেকে যায়, আমাদের দেশে শিক্ষাকে কতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয় বা সরকার দিয়ে থাকেন। যদি সরকার গুরুত্ব দিয়ে থাকেন তাহলে কি করে শিক্ষা খাতে জাতীয় বাজেটের মাত্র ১·২٪ ব্যয় করা হয়? দীর্ঘদিন যাবৎ ইউনেস্কোর প্রস্তাব ছিল ৭٪। আমাদের দেশের শিক্ষাখাতে ব্যয় কোন দিন ইউনেস্কোর প্রস্তাবের ধারেকাছেও যায়নি। এ ছাড়াও ডঃ কুদরত-ই-খোদা তাঁর শিক্ষা রিপোর্টে শিক্ষাকে জাতীয়করণের জন্য জাতীয় বাজেটের ২৫٪ শিক্ষাখাতে ব্যয় করার প্রস্তাব করেছিলেন। যমুনা ব্রীজের জন্য যদি সারচার্জ ধার্য করা যেতে পারে তা হলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতির জন্য কেন সারচার্জ ধার্য করা যাবে না? এ ক্ষেত্রে যে সরকারের আন্তরিকতার অভাব রয়েছে তা বলাই বাহুল্য। শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দের মাধ্যমে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান প্রয়োজন।

(খ) প্রশাসনঃ শিক্ষা প্রশাসনকে অবশ্যই দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। পরীক্ষা কেন্দ্র নির্ধারণ করার সময় পরিলক্ষিত হয় এদেশের রাঘব-বোয়ালদের তদ্বির দ্বারা নিজেদের আওতাধীন স্কুল-কলেজগুলোতে পরীক্ষা কেন্দ্রের অনুমতি নেয়া হয়। সরকারী নির্দেশ ছিল একটি উপজেলায় একটি কেন্দ্র হবে। কিন্তু কি করে একটি ইউনিয়নে ২টি কেন্দ্র স্থাপিত হলো? নির্ধারিত সময়ের পরেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করানোর হয় রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে। কিভাবে ভুয়া শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে বছরের পর বছর ধরে সরকারী টাকা আত্মসাৎ করা সম্ভব হচ্ছে? কারচুপি ও দুর্নীতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উচ্চ পর্যায়ের একটি ইনভেষ্টিগেশন টিম গঠন করতে হবে। প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই টিমের প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে এই সমস্ত দুর্নীতি উৎখাত করা যেতে পারে এবং অপরাধীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি ঃ আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধার্যকৃত বাৎসরিক ছুটি অযৌক্তিক। স্কুল- কলেজগুলোতে ৫/৬ মাস ছুটি থাকে। এছাড়া নানা কারণে স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকে প্রায়ই। যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশুনার অন্যতম অন্তরায়। শুধুমাত্র রমযানের জন্য দেড়মাসব্যাপী ছুটি সম্পূর্ণই অযৌক্তিক। ঈদুল ফিতরের জন্য বড়জোর এক সপ্তাহ ছুটি দেয়া যেতে পারে। শীতকালীন ছুটি, গ্রীষ্মকালীন ছুটির প্রয়োজন মনে করি না। তার পরেও আছে মে দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, ১৬ই ডিসেম্বর, ২৬শে মার্চসহ বেশ কিছু ছুটির দিন। এই দিনগুলি খুবই গুরুত্ব বহনকারী দিন। তাই এই সব দিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সমাবেশ ঘটিয়ে কর্মসূচী পালন করা যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থীর মনে ছুটির দিনগুলো সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা এবং তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। যদিও কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানে ছুটির দিনের কর্মসূচী পালিত হয়, কিন্তু আমার মতে সকল শিক্ষা প্রতিষ্টানে তা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

পরীক্ষা পদ্ধতি

আমাদের দেশে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বছরের শেষে মুখস্থ করা বিদ্যা পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। বছরের শেষের দিকে একটি মাত্র পরীক্ষার উপর জোর দেয়ার কারণে সত্যিকারের মেধারী ও প্রতিভাবানদের চিহ্নিত করা যেমন একদিকে কঠিন হয়ে পড়ে অন্যদিকে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীরা কোন্ বিষয়টিকে বুঝতে পারলো না তা ঠিক করা যায় না বলে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়তির দিকে। তার ওপর আবার স্বজনপ্রীতিরও অভিযোগ পাওয়া যায়। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় পরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিৎ নিম্নরূপঃ

(ক) শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশের গতিধারা কি, তার দূর্বলতা কোথায় এবং কোন্ পদ্ধতিতে তার সুপ্ত শক্তিসমূহের প্রকৃত বিকাশ হবে তা নির্ধারণ করা।

(খ) উচ্চতর স্তরে শিক্ষালাভে আগ্রহী শিক্ষার্থীর সফল অধ্যয়নের অনুকূলে কতটুকু মেধা, আগ্রহ, বুদ্ধি ও শক্তি আছে তা নির্ধারণ করা।

(গ) শিক্ষার্থীর যোগ্যতার ভিত্তিতে কাকে কোন্ কাজে বা কোন্ পেশায় নিয়োজিত করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নতি সাধিত হবে তা নির্ধারণ করা।

দেশে প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সাথে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যের সাথে আমাদের পরীক্ষাসমূহের কোন মিল নেই। প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতি দিয়ে আর যাই হোক আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্য পূর্ণ হতে পারে না। আমাদের দেশে বর্তমানে নিম্নলিখিত বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগ করা যেতে পারেঃ

১। আন্তঃ পরীক্ষা ও বহিঃ পরীক্ষা।

২। লিখিত ও মৌখিক (মানবিক) এবং লিখিত ও ব্যবহারিক (বিজ্ঞান ও কারিগরি)

৩। রচনামূলক, অবজেকটিভ বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে বিশেষ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে পরীক্ষা।

৪। বাক্যনির্ভর ও কার্যনির্ভর পরীক্ষা। শিক্ষাকে পুঁথিগত মুখস্তবিদ্যা হিসেবে আয়ত্ত করার পরিবর্তে আত্মস্থ করার লক্ষ্যেই উপোরক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

এই পদ্ধতি বাস্তবায়ন করার জন্য দুটি সেল গঠনের প্রয়োজন। প্রথম সেলটির কাজ হবে প্রশ্নপত্র সম্পর্কিত গবেষণা ও প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা। অত্যন্ত গোপনীয় সেল যা অন্য কোন কাজ করবে না। এই সেলটি এক একটি বোর্ডের প্রশ্নপত্র তৈরী করবে। প্রশ্নপত্রের মধ্যে যেন অবশ্যই উপরে উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহের সমন্বয় ঘটে। এই সেল দেশের উচ্চ শিক্ষিত ও শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে গঠন করতে হবে।

দ্বিতীয় সেলটির কাজ হবে লিখিত পরীক্ষার শেষে মৌখিক ও ব্যবহারিক পরীক্ষা গ্রহণ। এই সেলটিও গঠিত হবে পূর্বের মত। লিখিত পরীক্ষার পরে প্রচর সময় থাকে, যে সময়ের মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্রে নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী সেলের প্রতিনিধিদের সম্মুখে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। সেল কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর বসানো হবে এবং ঐ ফরমের একটি কপি স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়া যেতে পারে।

পরীক্ষাকেন্দ্রে কি জাতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে

(ক) পূর্বের চেয়ে বর্তমানে আমাদের দেশে যোগাযোগ ব্যবস্থার সামান্য উন্নতি হলেও হয়েছে। সুতরাং একটি উপজেলায় একাধিক কেন্দ্রের কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। স্নাতক পরীক্ষা জেলা সদরে অনুষ্ঠিত করতে হবে।

(খ) পরীক্ষা কেন্দ্রে কোন মতেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের প্রবেশ কিংবা তদারকি করতে দেয়া যাবে না। শিক্ষকতা জীবনে ১৫ বছরের নীচে অভিজ্ঞতার শিক্ষকদের কেন্দ্রে তদারকি করতে দেয়া যাবে না। উপজেলা ও জেলা মেজিষ্ট্রেট, জুডিশিয়াল বিভাগের কর্মকর্তা ও প্রশাসনে আস্থাবান ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে সার্বক্ষণিক তদারকি ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে।

(গ) বর্তমানে পরীক্ষা কেন্দ্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা শুধুমাত্র পুলিশ বাহিনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। পুলিশ বাহিনীর পাশাপাশি সেনাবাহিনীরও উপস্থিতি প্রয়োজন। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য যদি তারা অংশগ্রহণ করতে পারেন তা হলে সুষ্ঠু পরীক্ষা গ্রহণের জন্য কেন পারবেন না?

(ঘ) অসদুপায় অবলম্বন শিক্ষার্থীদের পাসের একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এ সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে শিক্ষকেরা। যারা নাকি মানুষ গড়ার কারিগর। খোদ শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ধরা পড়লেন বেচারা শিক্ষক। বলতে লজ্জা এবং দুঃখ দুটিই হয়। যাদেরকে আদর্শের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয় তারাই এই কর্ম সম্পাদন করেন। পরীক্ষার হলে কোন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হঠাৎ প্রবেশ করলে, শিক্ষক মুখে শিষ্ দিয়ে পরীক্ষার্থীদের জানিয়ে দেয়। কি দুর্ভাগ্য এই জাতির! তারপর রয়েছে অভিভাবক ও সাহায্যকারীগণ। ছেলেকে নকল দেয়ার জন্য পিতা পুলিশের মার খেতেও দ্বিধা করেন না। 'সত্যি সেলুকাস কি বিচিত্র এইদেশ।'

এ থেকে মুক্তি পেতে হলে আইনের শাসন প্রয়োজন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ত্রিমুখী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। একদিকে শিক্ষক ও পরীক্ষার্থী, অন্যদিকে সাহায্যকারী নামের অভিভাবক। আইন অনুযায়ী এদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর কেন্দ্রের বাইরে কথিত সাহায্যকারী সন্দেহ যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের ক্ষমতা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার হাতে দিতে হবে।

জিয়াউদ্দিন তৌহিদ
যুগ্ম- সাধারণ সম্পাদক,
বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় সংসদ,
১১, বঙ্গবন্ধু এভিনিউ,
ঢাকা।